তারিখ ... 25 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে টুংটাং ছেলেখেলা বন্ধ করতে হবে

মনের কোণে হীরে-মুক্তো

ড. সা'দত হুসাইন

উপমহাদেশের বিশ্বনন্দিত শিক্ষাপদ্ধতিকে ভেঙেচুরে রংবেরঙের পরিবর্তন এনেছি। একবার ভেঙেছি, আবার জোড়া দিয়েছি; আবার ভেঙেছি। আমাদের অবস্থা হয়েছে যেন 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে'। আমাদের ফিরে যেতে হবে শিকড়ের কাছে। যে কথা লন্ডনের শিক্ষা বিভাগ আমাকে বলেছিল নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। উপমহাদেশের সুমহান ঐতিহ্য ও শিক্ষাপদ্ধতিকে মূল ভিত্তি ধরে বর্তমান যুগের প্রযুক্তি ও সর্বজনসম্মত উদ্ভাবন প্রয়োগ করে তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে

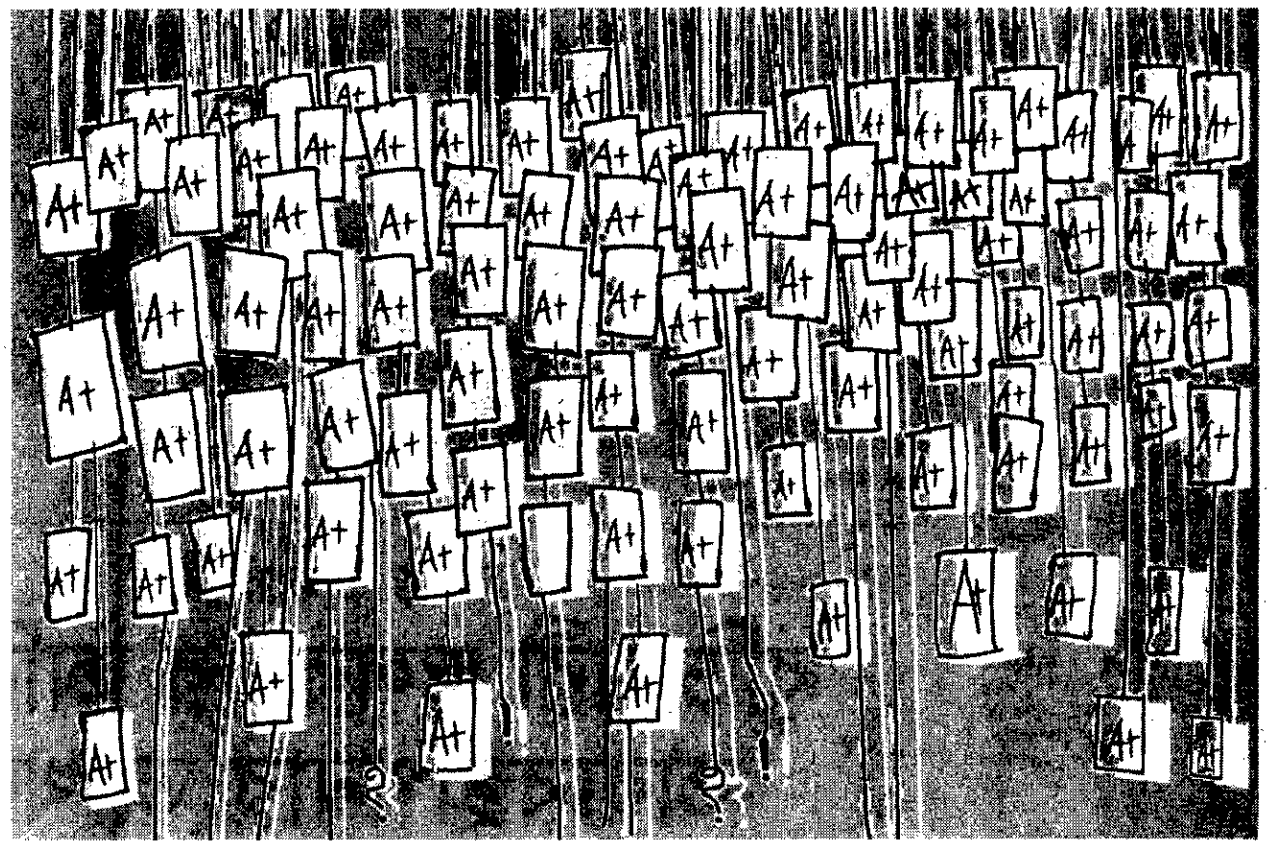

স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদে যোগদান করি। বর্তমান সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। এতদসত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল একটি ক্ষুদ্রাকৃতির মন্ত্রণালয়। আমার যোগদানের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের আকার ছিল সচিব, চারজন উপসচিব ও ডজনখানেক সহকারী সচিব। মাস কয়েক পর একজন যুগ্ম সচিব যোগ দেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের বড় আলোচিত বিষয় ছিল কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট। স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানোর রূপকল্প দেওয়া হয়েছিল এই দলিলে। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তাঁর সময়ে রিপোর্টের ওপর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়নি। পরবর্তীকালে অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যালোচনা করা শুরু করা হয়। এ জন্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও নায়েমের কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যার সদস্যসচিব হিসেবে ছিলাম আমি। রিপোর্টটি অধ্যায়ওয়ারি পর্যালোচনা করে আমরা সরাসরি গ্রহণযোগ্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কর্মপন্থা ঠিক করতে চেষ্টা করতাম। যেসব সুপারিশের ওপর বৃহত্তর পরিসরে সেমিনার-ওয়ার্কশপ বা সম্মেলনে আলোচনার প্রয়োজন হবে সেসব সুপারিশ চিহ্নিত করতাম। কাজটি ভালোই চলছিল। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। রিপোর্টটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও নতুন ভাবনাচিন্তার আভাস পাওয়া যায়।

তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা রকম পরিবর্তন এসেছে। নতুন নতুন কমিশন হয়েছে। সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা বর্ণের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, এনজিও নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হয়েছেন। এর মধ্যেই আমি আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে এসেছি। প্রথমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব হিসেবে, এরপর শিক্ষা বিভাগের সচিব হিসেবে। তত দিনে জজবা উঠেছে পুরনো শিক্ষাপদ্ধতি ভুল, সবই ভুল। সম্প্রসারিত করলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় পুরনো পদ্ধতিতে যারা পড়ালেখা করেছে তারা হয় কিছু জানে না অথবা যা জেনেছে তার সবই ভুল। ভাবসাবে মনে হয় এখন ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের কাছ থেকে তাদের নতুন পদ্ধতিতে নতুনভাবে আবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আগে যা শেখা হয়েছে তা যত দূর সম্ভব ভুলে যেতে হবে। ৩৫-৪০ বছর ধরে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আমরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বললে ভুল হবে। আসলে আমরা টুংটাং ছেলেখেলায় রত হয়েছি। অবশেষে দেখা গেছে, এতে খুব একটা এগোতে পারেনি। বরং ভালো যা ছিল তা বিনষ্ট করেছি।

জাতি এখন উদ্বিগ্ন হয়ে দেখছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। শিক্ষার মান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিমজ্জিত। সবচেয়ে সর্বনাশ হয়েছে আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি বা পরীক্ষাব্যবস্থার। পরীক্ষার ফলাফল বা পাস-ফেলকে কোনো ধরনের যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া আমরা রাজনৈতিক সরকারের সফলতা-ব্যর্থতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছি। বিভিন্ন ধরনের অলিখিত নির্দেশ, ইশারা- ইঙ্গিতের মারফত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যেমন করে হোক পাসের হার বাড়িয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে শতভাগের খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। অতএব ফেল করানো যাবে না। সর্বোচ্চ গ্রেডের ছড়াছড়ি থাকতে হবে, দেখতে-শুনতে যাতে ভালো লাগে। পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি প্রচলনের নামে না বুঝে বিদেশি পদ্ধতি আধা প্রয়োগ করে পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করেছি। উত্তর ভুল হলে নম্বর কাটা যাবে না—এ ধরনের উদ্ভট বিকৃত শর্ত জুড়ে দিয়ে এমসিকিউ (Multiple Choise Question) ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্য বই, এমনকি যেকোনো বইপত্র থেকে সরে এসে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষার হলে ঢুকে পড়েছে। আমি নিকটাত্মীয়ের ছেলেমেয়েদের বলতে শুনেছি যে 'টিক'-এর পরীক্ষায় পড়াশোনার দরকার নেই, যেকোনো বিকল্পে টিক মেরে দিলেই পাস হয়ে যাবে। আমার ধারণা, হয়েছেও তাই।

পড়াশোনা ছাড়াই এ ধরনের পরীক্ষার্থীরা পাস করে গেছে, 'এ' প্লাস পেয়েছে। পত্রিকান্তরে দেখলাম, এক বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়েও কয়েকজন পরীক্ষার্থী পাস করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, 'এ' গ্রেড পাওয়া পরীক্ষার্থীর আসলে পরীক্ষা পাসের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষায় সে শতকরা শূন্য থেকে বড়জোর ১০ পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় মাত্র ২ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রায় একই ধরনের। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় স্কুল-২ গ্রুপে পাসের হার ৩.২২ শতাংশ। জিপিএ ৫ পাওয়া এক ছাত্রীর লিখিত একটি চিঠি এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। নিচের চিঠিটি ২০১৩ সালে একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল : 'আমি ২০১০ সালে মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি ও ২০১২ সালে মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে এইচএসসি পাস করেছি। প্রথম প্রথম কেউ যখন আমার রেজাল্ট জানতে চাইত, তখন কিছুটা গর্বের সঙ্গে বলতাম, আমি জিপিএ ৫ পেয়েছি। এ গর্ব অহেতুক গর্ব নয়। ছোটবেলা থেকেই আমি পড়ালেখার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী। পাশাপাশি সৃজনশীল লেখালেখিরও চর্চা করি। আমার মেধা, আগ্রহ ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আমি অর্জন করেছি জিপিএ ৫। কিন্তু এত সাধের অর্জনের কথা বলতে বর্তমানে আমার কেমন যেন সংকোচ বোধ হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক—সর্বত্রই এখন বইছে জিপিএ ৫-এর জোয়ার। কেউ যদি ভাবে, আমি সেই জোয়ারে ভেসে আসা একটি-৫। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামকরা শিক্ষকও জিপিএ ব্যবস্থার গলদ ও জিপিএ ৫ স্ফীতির ভয়াবহতা নিয়ে লিখেছেন, চলমান প্রেক্ষাপটে যা খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কষ্ট লাগে তখন, যখন সব A+ ধারীকে একই পাল্লায় মাপা হয়। হীনম্মন্যতায় ভুগি, যখন কিছু সুযোগসন্ধানী শিক্ষার্থীর কারণে অন্যদের গায়ে লেগে যায় অযোগ্য তকমা। কী লাভ হলো জিপিএ ৫ পেয়ে, যখন জিপিএ ৫-এর বিশেষ কোনো মূল্যায়নই রইল না? এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। জিপিএ ৫ চাই না। চাই একটি মানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি, যেখানে মেধা, সৃজনশীলতার স্বীকৃতি থাকবে। সত্যিকার স্বীকৃতি।'

চলতি বছর আরেকটি দৈনিকে প্রকাশিত একজন কলামিস্টের লেখায়ও শিক্ষা ও পরীক্ষার বর্তমান করুণ চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কলামিস্ট লিখেছেন, 'পাবলিক পরীক্ষায় বেশি পাসের আনন্দ সরকার সফলতার সঙ্গে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পেরেছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার যেন বিদ্যুতের গতিকে হার মানিয়ে ছাড়ছে। ছাত্রছাত্রী কী পড়াশোনা করল এবং কী পরীক্ষা দিল সেটা বড় কথা নয়, পাস করিয়ে দেওয়া হলো কি না সেটাই প্রধান। আলামতে মনে হয়, শিগগিরই দেশে ফেল বলে আর কিছু থাকবে না। পরীক্ষাই দেয়নি কিন্তু জিপিএ ৫ পাওয়ার খবরও গণমাধ্যমের কল্যাণে দেখা গেছে। শিক্ষাব্যবস্থা মান হারিয়ে ফেললে তাতে পাস-ফেল, থার্ড ডিভিশন আর গোল্ডেন জিপিএ ৫-এর তফাত কী? সম্প্রতি মাছরাঙা টিভি সাক্ষাৎকার নিয়েছে জিপিএ ৫ পাওয়া কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর। তারা এখনো জানে না জিপিএ ৫ মানে কী? জানে না জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায়! দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি কে! স্বাধীনতা, বিজয় দিবস কবে! একটি বাক্য ইংরেজিতে রচনা করতে পারেনি একজন! এ হলো দেশের হাজার হাজার জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের অবস্থা। কোয়ালিটি বাদ দিয়ে কোয়ান্টিটি নিয়ে যারা গলদঘর্ম তাদের কী বলব, বলদ! সোনালি পাস পদ্ধতির উদ্ভাবকরা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে গেছেন অনেকেরই তা একটু উপলব্ধিতে আসতে শুরু করেছে। এতে যন্ত্রণা শুধু শিক্ষার্থীর নয়, অভিভাবকদেরই বেশি।'

এটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি ইংরেজি দৈনিকে বিশ্লেষক কলামিস্ট মন্তব্য করেছেন 'The failure of the part of GPA-5 achiever to answer the simple questions they were asked by the TV Reporter is definitely a cause for serious concern. The standard of learning by students cannot be so poor. Once again the systemic weakness of education has been grossly exposed. Teachers cannot think out of the box and they draw heavily from guidebooks for setting question papers. Students are clever enough to know this secret and consult guidebooks. Thus they miss the wood for the trees.'

অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান বিষয়েও বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতার পর নানা রংবেরঙের চমকদার বক্তব্য দিয়েছেন। বিভিন্ন সরকারের নীতিনির্ধারকরা এসব বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করেছেন, আবার ভিন্ন দলের-নীতিনির্ধারকরা এ পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা উপস্থাপন করে সে পদ্ধতি বাতিল করে নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেছেন। এর ফলে উপমহাদেশের মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি। যেসব চিত্তাকর্ষক নতুন ধারণা আমাদের কালোত্তীর্ণ শিক্ষণ প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে তার শীর্ষে রয়েছে : ১. অধ্যয়নকালে মুখস্থ (memorise) করার অভ্যাস সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে; ২. পড়াশোনার জন্য খাটাখাটুনি, সাধ্যসাধনা করা সমীচীন হবে না; পড়াশোনা হবে আনন্দ-উল্লাসের ব্যাপার, হাসিখেলার ব্যাপার; ৩. ক্লাসরুম হবে আনন্দমেলার অংশবিশেষ; ৪. শিক্ষকরা হবেন বন্ধুর সমপর্যায়ের, তাঁদের ভিন্নভাবে দেখা যাবে না এবং ৫. শিক্ষা গ্রহণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে আইটি বা তথ্যপ্রযুক্তি; পাঠ্য বইয়ের চেয়ে ইন্টারনেট শ্রেয়, 'নেট'-এ অনেক তাড়াতাড়ি অনেক বেশি শেখা যায়। পাঠ্য বই না পড়লেও চলে।

মুখস্থ করা পাঠাভ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপমহাদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার এটি একটি অমূল্য ঐতিহ্য। যার মুখস্থ করার ক্ষমতা ক্ষীণ, সে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়বে। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তার ঘাটতি থেকে যাবে। পড়াশোনার এমন কিছু বিষয় বা অংশ আছে, যেখানে মুখস্থ করার কোনো বিকল্প নেই। শব্দের বানান, অঙ্কের ফর্মুলা, রসায়নের কিছু মৌলিক তথ্য, কবিতার পঙ্‌ক্তি যেকোনো ছাত্রকে মুখস্থ করতে হবে। অন্যথায় সে এগোতে পারবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে মুখস্থ করার পদ্ধতি সহজ করে নেওয়া যায়। কিন্তু একেবারে কোনো কিছু মুখস্থ করব না, বুদ্ধি ও মেধার জোরে সব সমস্যা ও পরিস্থিতি উতরে যাব—এমন চিন্তা করে বসে থাকলে পরীক্ষা পাস করা তো দুঃসাধ্য হবেই, এমনকি বাস্তব জীবনেও যে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। আমি সারা জীবন মুখস্থ বিদ্যার চর্চা করেছি, এখনো বহু কিছু মুখস্থ করি। মুখস্থ বিদ্যা বড় বিদ্যা।... যদি মেধা থাকে, তবে মুখস্থ করতে করতে একসময় নতুন বোধোদয় হয়। মনে প্রশ্ন জাগে, প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইচ্ছা করে। শুরু হয় ত সাধনা। মুখস্থ করার অভ্যাস বা ক্ষমতা জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টার সাংঘর্ষিক নয়। বরং প্রায়শই তা জ্ঞান সাধনার পরিপূরক।

পরিবেশ এমন হয়েছে যে মুখস্থ করার পক্ষে লোকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চায় না। একটি ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা আমাকে এ সত্য প্রকাশ্যে বলতে সাহস জুগিয়েছে। আমার এক জুনিয়র সহকর্মী, যে আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান, অকপটে আমাকে জানাল যে তার ভালো ফলাফল ও সাফল্যের পেছনে রয়েছে মুখস্থ বিদ্যা। মুখস্থ বিদ্যার সঙ্গে মেধা ও মননের সম্মিলন ঘটিয়ে সে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। আমার বিশ্বাস, সে আরো ওপরে যাবে। আমার ধারণা, দেশে এখনো অনেক লোক আছে যারা বুঝেশুনে মুখস্থ করাকে জ্ঞানার্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। পরিবেশ এমন হয়েছে যে তারা প্রকাশ্যে তা বলতে জড়তা বোধ করে। সময় এসেছে এখন সত্য প্রকাশ্যে বলতে হবে। খাটাখাটুনি বা অভিনিবেশের বদলে আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা সমীচীন হবে—এমন যুক্তি কত দূর বাস্তবানুগ তাও পর্যালোচনা করে দেখার দরকার। ছাত্রছাত্রীদের পাঠকক্ষে ভীতিকর পরিবেশ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে স্কুলের পাঠকক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে খেলাঘর বা বিনোদন 'কর্নার' হতে পারে না। জ্ঞানার্জনের জন্য সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন হয় মনোযোগ, সতর্কতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়। এর অনুশীলন চলে শ্রেণিকক্ষে। বিনোদনমূলক অধিবেশন অবশ্যই থাকবে; তা হবে পুরো সময়ের একাংশ মাত্র। যে শিক্ষার্থী সব সময় হৈ-হুল্লোড়, আনন্দ-উৎসবের মধ্যে থাকতে চায়, পরিশৃঙ্খল পরিবেশ পাঠাভ্যাস চায় না, তার পক্ষে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হবে না। জ্ঞানার্জন করতে হলে তার আচরণ (Behavior) পরিবর্তন করতে হবে। পড়াশোনা শুধু হাসিঠাট্টা, ফুর্তির ব্যাপার নয়; এর পদ্ধতির মধ্যে আরো গভীরতা রয়েছে।

শিক্ষকরা হবেন একেবারে বন্ধুর মতো, এটিও উপমহাদেশীয় শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এ অঞ্চলে শিক্ষককে 'গুরু' হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষক বা 'গুরু'র সম্মান মা-বাবার সমান; কখনো কখনো তারও বেশি মনে করা হয়। গুরুর সুনিবিড় তত্ত্বাবধানে শিষ্য বা ছাত্রকে জ্ঞানার্জন কর্মে নিবিষ্ট হতে হয়। শিক্ষক তাঁর অমেয় স্নেহ ও আবশ্যকীয় শাসন দিয়ে ছাত্রকে শিক্ষিত করে তোলেন। শিক্ষক যে 'Friend, Philosopher and guide' এ কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিলে ভুল হবে। এখানে Friend মানে 'তুই-তুকারি' করা সতীর্থ বন্ধু নয়। এখানে বন্ধুত্বকে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সুরক্ষণ অর্থে বোঝানো হয়েছে। তার সঙ্গে Philosopher and guide মিলে একটি প্যাকেজ হয়েছে। এ প্যাকেজে যিনি রয়েছেন তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর কোনো তুলনা নেই, তিনি নিজেই নিজের তুলনা। উপমহাদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের শক্তিতেই গুরু বা শিক্ষকের সান্নিধ্যে যুগে যুগে অগুনতি জ্ঞানী-গুণী সৃষ্টি হয়েছেন। এর বিকৃতি ঘটিয়ে আমরা যে খুব লাভবান হয়েছি এমনটি বলা যাবে না।

তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) আমাদের কর্ম, আমাদের জীবনকে অভাবনীয় রূপে সমৃদ্ধ করেছে। শিক্ষণ প্রশিক্ষণে আইটির প্রয়োগ বিদ্যার্জনকে সহজ ও দ্রুত করবে। বিদ্যাভ্যাসে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সহায়ক ভূমিকা পালন করলে তা হবে গ্রহণযোগ্য। তবে তা নিয়মিত পড়াশোনার পুরো বিকল্প হতে পারে না। ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করতে হলে পাঠ্য বই ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে। শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করলে সে শিক্ষার প্রয়োগ গভীর ও টেকসই হবে না। জীবনের সব কথা, সব কাজ ইন্টারনেটে দিয়ে হয় না। কিছু জ্ঞান অন্তর্বিদ্ধ (embodied)। সেই অন্তর্বিদ্ধ জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে বাস্তব জীবনে বহুবার হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের জীবনে তাই ঘটছে।

এ অবস্থা চলতে পারে না। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আমরা বহুবার টুংটাং ছেলেখেলায় রত হয়েছি। উপমহাদেশের বিশ্বনন্দিত শিক্ষাপদ্ধতিকে ভেঙেচুরে রংবেরঙের পরিবর্তন এনেছি। একবার ভেঙেছি, আবার জোড়া দিয়েছি; আবার ভেঙেছি। আমাদের অবস্থা হয়েছে যেন 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে'। আমাদের ফিরে যেতে হবে শিকড়ের কাছে। Back to Basics, যে কথা লন্ডনের শিক্ষা বিভাগ আমাকে বলেছিল নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। উপমহাদেশের সুমহান ঐতিহ্য ও শিক্ষাপদ্ধতিকে মূল ভিত্তি ধরে বর্তমান যুগের প্রযুক্তি ও সর্বজনসম্মত উদ্ভাবন প্রয়োগ করে তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। যে ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করে অতীশ দীপঙ্কর, জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বোস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আর সি মজুমদার, সুভাষ বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, যাদবচন্দ্র (গণিতজ্ঞ), অমর্ত্য সেন, এপিজে আবদুল কালাম, হুমায়ুন কবির, বুদ্ধদেব বসু, ড. ইউনূস, ড. জামাল নজরুল ইসলাম সৃষ্ট হয়েছেন, সে ধারার মৌলিক শক্তিকে লালন করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

লেখক : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান